শারহুল আক্বীদা আত্-ত্বহাবীয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৩৫. জান্নাতীদের জন্য আল্লাহকে দেখার বিষয়টি সত্য। তবে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে নয়, তার পদ্ধতিও আমাদের অজানা। ......

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী (রহিমাহুল্লাহ)

আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীকারকারীদের দলীল ও তার জবাব - ৩

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহর উক্তি: بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ ‘‘অর্থাৎ আমরা মুমিনদের জন্য আল্লাহর দিদার সাব্যস্ত করি, তবে তাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে নয়। আমরা সেই দিদারের কোনো ধরণও সাব্যস্ত করি না। আল্লাহ তা‘আলার পরিপূর্ণ বড়ত্ব এবং তার নূরের উজ্জ্বলতার কারণে কোনো সৃষ্টির পক্ষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাকে পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করা এবং তার প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা অসম্ভব। সুতরাং দৃষ্টিসমূহ তাকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু জ্ঞানের মাধ্যমে তাকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

‘‘দৃষ্টিশক্তি তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। কিন্তু তিনি দৃষ্টিকে আয়ত্ত করে নেন’’ (সূরা আনআম: ১০৩)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

‘‘তারা জ্ঞান দ্বারা তাকে আয়ত্ত করতে পারে না’’। (সূরা ত্বহা: ১১০) আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

‘‘সেদিন বহু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে’’। (সূরা আল কিয়ামাহ ৭৫:২২-২৩) এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলাকে মুমিনগণ দেখবে বলে যে কথা বলা হয়েছে, তার ব্যাপারে ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহর উক্তি: وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ ‘‘আল্লাহ তা‘আলাকে দেখার ব্যাখ্যা হলো, একমাত্র আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা করেন এবং যেভাবে তিনি জানেন সেভাবেই এটি অর্জিত হবে।

এ সম্পর্কে যা কিছু ছহীহ হাদীছে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে, তা যেভাবে তিনি বলেছেন সেভাবেই গৃহীত হবে এবং তিনি যা উদ্দেশ্য করেছেন সেটিই ধর্তব্য হবে। তিনি আরো বলেন, এতে আমরা আমাদের মতের উপর নির্ভর করে কোনো অপব্যাখ্যা করবো না এবং আমাদের প্রবৃত্তির প্ররোচনায় নিপতিত হয়ে কোনো অযাচিত ধারণার বশবর্তী হবো না।

আল্লাহ তা‘আলাকে দেখার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছের বক্তব্যগুলোকে মুতাযেলারা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে, আমরা সেগুলোকে ঐভাবে ব্যাখ্যা করবো না। কেননা তাদের ব্যাখ্যায় আল্লাহর কালাম ও রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর আসল অর্থ পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। কুরআনের আয়াতের যে ব্যাখ্যা সুন্নাতের অনুরূপ হয়, তাই হলো সঠিক ব্যাখ্যা। আর যে ব্যাখ্যা সুন্নাতের বিপরীত হয়, তা বাতিল ব্যাখ্যা।

বর্ণনা প্রসঙ্গ যে ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে না এবং যার পক্ষে কোনো আলামতও থাকে না, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাণীর মাধ্যমে উহা উদ্দেশ্য করেননি। কুরআন ও হাদীছের বক্তব্য থেকে যদি প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য না হয়ে অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য হতো, তাহলে অবশ্যই বাক্যের সাথে এমন কিছু আলামত যুক্ত হতো, যা প্রমাণ করতো যে এখানে সুস্পষ্ট অর্থের বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য। যাতে করে শ্রোতাগণ সন্দেহ ও ভুলের মধ্যে নিপতিত না হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট করেই তার কালাম নাযিল করেছেন। এতে রয়েছে মানুষের জন্য হেদায়াত। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি বাহ্যিক অর্থের বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য করে থাকেন এবং সেই অর্থটি বুঝানোর জন্য এমন কোনো ইঙ্গিত না করে থাকেন, যা বাহ্যিক অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ প্রত্যেক লোকের বোধশক্তির মধ্যে প্রবেশ করে, তাহলে কুরআনকে সুস্পষ্ট বর্ণনা হিসাবে নাম দেয়া ঠিক হতো না। এবং এটি মানুষের জন্য হেদায়াতও হতোনা। সুতরাং বক্তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংবাদ দেয়াকে তাবীল বলা হয়। এতে নতুন করে কিছু তৈরী হয় না।

এ স্থানে অনেকেই ভুল করে থাকে। বক্তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝানোর নাএ তাবীল। যখন বলা হয়, এ শব্দটির অর্থ হলো এটি, তখন এর দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে খবর দেয়া হয়। খবরটি যদি বাস্তব অবস্থার সাথে না মিলে, তাহলে বক্তার উপর মিথ্যা আরোপ করা হয়ে যায়। বক্তা তার বক্তৃতার মাধ্যমে কী উদ্দেশ্য করেছেন, তা বুঝার পদ্ধতি একাধিক।

(১) অনেক সময় বক্তা নিজেই তার বক্তৃতার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করে বলে দেয়।

(২) বক্তা তার উদ্দেশ্য বুঝাতে এমন শব্দ ব্যবহার করেন, যা উক্ত অর্থের জন্যই গঠন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বক্তা যদি তার বক্তব্যের মধ্যে এমন কোনো আলামত উল্লেখ না করেন, যাতে বুঝা যাবে যে, তিনি প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য করেননি, তখন যে অর্থের জন্য শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা দ্বারা তাই বুঝাবে। সুতরাং বক্তা যখন তার কালামের আসল অর্থ উদ্দেশ্য করবেন, যে অর্থের জন্য কালামটি গঠন করা হয়েছে তাই বুঝাবেন এবং সেই সঙ্গে বাক্যটি আসল অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার পক্ষে আলামতও থাকবে, তখন অন্য কালামকে অর্থে ব্যবহার করার কোনো সুযোগই থাকে না।

আল্লাহ তা'আলার এ বাণী: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيْماً "আল্লাহ তা'আলা মুসার সাথে সুস্পষ্ট কথা বলেছেন" (সূরা আন নিসা:১৬৩)। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عيانا كَمَا تَرَوْنَ الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب»

"নিশ্চয় তোমরা অচিরেই স্বচক্ষে তোমাদের রবকে দেখতে পাবে। যেমন মেঘহীন আকাশে দুপুর বেলা কোনো রকম অসুবিধা ছাড়াই সূর্য দেখতে পাও"।[15]

এ রকম সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে শ্রোতা বক্তার উদ্দেশ্য সহজেই বুঝতে পারে। আর বক্তা যখন তার কথার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে এমন শব্দ ব্যবহার করবে, যাকে ঐ অর্থের জন্যই গঠন করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে তার কথার মধ্যে উক্ত অর্থটি উদ্দেশ্য হওয়ার কারণও পাওয়া যাবে, তখন বক্তা তার কথার মধ্যে সত্যবাদী হবে। আর যখন কোনো বক্তব্যের এমন তাবীল করা হবে, যা বক্তব্য থেকে বুঝা যায় না এবং বক্তব্যের সাথে উক্ত তাবীলের পক্ষে কোনো আলামতও থাকে না, তখন যদি বলা হয় এ তাবীল হলো বক্তার উদ্দেশ্য, তাহলে এটি বক্তার উপর মিথ্যাচারের পর্যায়ে পড়বে। এটি হবে এগড়া ব্যাখ্যা এবং প্রবৃত্তির ধারণা মাত্র।

প্রকৃত বিষয় হলো, যারা বলে আমরা এ আয়াতকে এ অর্থে ব্যাখ্যা করবো অথবা এর মাধ্যমে তাবীল করবো,

তাদের কথার মাধ্যমে আসলে শব্দকে তার অর্থ থেকে পরিবর্তন করা হয় মাত্র। কেননা কুরআন-হাদীছের বাণী দ্বারা যখন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করা হয়, তখন যদি সে উহাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা না রাখে, তাহলে শব্দটির অর্থ পরিবর্তন করে ফেলে এবং বলে, আমরা এটিকে বাহ্যিক অর্থের বিপরীত অর্থে ব্যাখ্যা করবো।

আর যদি বলে আয়াতের আরেকটি অর্থ রয়েছে, আপনারা উহা উল্লেখ করেননি, তাহলে শব্দটি প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থে ব্যবহার করা অসম্ভব এবং তাকে বাতিল করাও সম্ভব নয়। সুতরাং শব্দটি যেহেতু কুরআন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে এবং তার বাহ্যিক অর্থ যেহেতু উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব নয়, তাই বলবো যে, এখানে রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। রূপক অর্থে গ্রহণ করবো, যদিও তাকে প্রথমত রূপক অর্থে গঠন করা হয়নি।

তাদের জবাবে বলা হবে, বক্তার কথার অর্থ সম্পর্কে এ খবর দেয়া যে, তিনি তার কথার মাধ্যমে এ অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন, এ সংবাদটি সত্য এবং মিথ্যা উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর এটি অসম্ভব যে, বক্তার কথার বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য হবে, অথচ তিনি শ্রোতাদের জন্য ঐ অর্থ বর্ণনা করবেন না। বরং বক্তার কথার মাধ্যএে জানা যায় যে, তিনি তার কথার দ্বারা প্রকৃত অর্থই উদ্দেশ্য করেছেন। তবে বক্তার কথার অর্থ কখনো কখনো তার বাহ্যিক অর্থের বিপরীত হয়ে থাকে। আমরা এটি অস্বীকার করি না। বক্তা যখন শ্রোতার নিকট আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখতে চায়, তখন সে তার কথার বাহ্যিক অর্থের বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য করে থাকতে পারে। তবে বক্তা যখন কোনো বিষয়কে সুস্পষ্ট করে বুঝাতে চাইবে এবং তার উদ্দেশ্য অন্যদেরকে বুঝাতে চাইবে, তখন সে তার কথার বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থের বিপরীত উদ্দেশ্য করবে, এটি অগ্রহণযোগ্য। এটি কিভাবে সম্ভব হতে পারে? অথচ বক্তা তার বক্তব্যের মধ্যে এমন কিছু উল্লেখ করে, যা রূপক অর্থের ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করে দেয়। সেই সঙ্গে সে তার কথাকে একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করে এবং তার কথাকে সুস্পষ্ট করার জন্য বহু উদাহরণ ও উপমাও পেশ করে থাকে।

অতঃপর ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, কোনো ব্যক্তি কেবল তখনই তার দ্বীনকে ভ্রষ্টতা ও বক্রতা থেকে নিরাপদ রাখতে পারে, যখন আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করবে এবং সংশয়ের ব্যাপার সমূহকে আল্লাহর দিকেই ফিরিয়ে দিবে। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর দলীলগুলো মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করা যাবে না এবং সেগুলোর বাতিল ব্যাখ্যাও করা যাবে না। এমনকি কারো এ কথার মাধ্যমেও শরীয়তের কুরআন-সুন্নাহর দলীলের বিরোধিতা করা যাবে না যে, বোধশক্তি তো এ দলীলের বিরোধী এবং বোধশক্তির দলীলই হলো আসল দলীল। এ কথাও বলা যাবে না যে, শরীয়াতের দলীল বুঝশক্তির দলীলের বিরোধী হলে বুঝশক্তির দলীলকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এটি কখনোই হতে পারে না। অর্থাৎ শরীয়তের দলীল ও বোধশক্তির দলীল কখনো পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হতে পারে না। তবে কখনো কখনো এ রকম সন্দেহ হয়ে থাকে। যেসব ক্ষেত্রে শরীয়তের ছহীহ দলীল ও বোধশক্তির দলীল পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে হয়, সেখানে যারা বুঝশক্তির দলীলকে জ্ঞাত বিষয় বলে দাবি করে, তাদের কথা ঠিক নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে তা জ্ঞাত নয়; বরং অজ্ঞাত। যে ব্যক্তি গভীর দৃষ্টি দিবে তার কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

আর যে হাদীছ ছহীহ নয়, তা বোধশক্তির দলীলের বিরোধি হওয়ার উপযোগী নয়। সুতরাং বিশুদ্ধ বর্ণনা এবং পরিশুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধি কখনো পরস্পর বিরোধী হয় না। যে ব্যক্তি বুঝশক্তির দলীলের মাধ্যমে শরীয়তের দলীলের বিরোধিতা করবে, তাকে বলা হবে, তোমার কথাকেই বিবেক-বুদ্ধির দলীল প্রত্যাখ্যান করে। তাকে বলা হবে,

বোধশক্তির দলীল শরীয়তের দলীলের বিরোধী হলে শরীয়তের দলীলকে বিবেক-বুদ্ধির দলীলের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা পরস্পর বিরোধী উভয় দলীলের মাধ্যমে সাব্যস্ত বিষয়কে একসাথে মেনে নেয়া হলে পরস্পর অসংগতিপূর্ণ দু’টি জিনিসকে এক সাথে একত্রিত করা আবশ্যক হয় এবং উভয় প্রকার দলীলকে পরিত্যাগ করলে পরস্পর বিপরীতমুখী দু’ই বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা আবশ্যক হয়। তাই বিবেক-বুদ্ধির দাবিকে শরীয়তের দলীলের উপর প্রাধান্য দেয়া অসম্ভব। কেননা বিবেক-বুদ্ধির দলীল কুরআন-সুন্নাহর দলীল সত্য হওয়ার সাক্ষ্য দেয় এবং রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সংবাদ প্রদান করেছেন, তা কবুল করে নেয়াকে আবশ্যক করে। সুতরাং আমরা যদি শরীয়তের এ দলীলকে বাতিল করে দেই, তাহলে বিবেক-বুদ্ধির দলীলকেও বাতিল করে দেয়া আবশ্যক হবে। আর বিবেক-বুদ্ধির দলীল যদি বাতিল হয়, তাহলে তা শরীয়তের দলীলের বিরোধী হওয়ার উপযোগী হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেননা যে জিনিস নিজেই দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়, সে অন্যান্য দলীলের বিরোধী হওয়ার যোগ্যতাও রাখে না। সুতরাং ফলাফল এ দাড়ালো যে, বিবেক-বুদ্ধি ও মস্তিস্কের চিন্তা প্রসূত দলীলকে কুরআন-সুন্নাহর দলীলের উপর প্রাধান্য না দেয়া আবশ্যক। তাই একে প্রাধান্য দেয়া অবৈধ। এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট বিষয়।

বিবেক-বুদ্ধির দলীল প্রমাণ করে যে, কুরআন-সুন্নাহর দলীল সত্য, বিশুদ্ধ এবং তার সংবাদ বাস্তবতার সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। সুতরাং শরীয়তের যে দলীলকে বিবেক-বুদ্ধি সমর্থন করেছে, তা বাতিল হওয়ার কারণে যদি দলীল দ্বারা সাব্যস্ত বস্তুও বাতিল হয়, তাহলে আবশ্যক হয় যে, মানুষের বুঝশক্তি বিশুদ্ধ ও নির্ভুল কোনো দলীল নয়। আর বুঝশক্তি যদি বিশুদ্ধ কোনো দলীল না হয়, তাহলে তাকে শরীয়তের দলীলের উপর প্রাধান্য দেয়া তো দূরের কথা, কখনোই তার অনুসরণ করা জায়েয নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিবেক-বুদ্ধির দলীলকে কুরআন-সুন্নাহর দলীলের উপর প্রাধান্য দেয়া হলে বুঝশক্তির দলীলই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়।

প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক হলো, সে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের সামনে নিজেকে সোপর্দ করবে, তার আদেশের সামনে নত হবে এবং তার সংবাদকে সত্য বলে মেনে নিবে। আমাদের জন্য কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয় যে, ভ্রান্ত কল্পনার মাধ্যমে আমরা তার বিরোধীতা করবো। ভ্রান্ত কল্পনাকে বিবেক-বুদ্ধির দলীল নাম দিয়ে তাকে শরীয়তের দলীলের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো বৈধ নয়। সন্দেহের বশবতী হয়ে কুরআন-সুন্নাহর দলীলের ব্যাখ্যা করা আমাদের জন্য বৈধ নয় কিংবা কুরআন-সুন্নাহর দলীলের উপর মানুষের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া এবং মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত মতবাদকে শরীয়তের অকাট্য দলীলের উপর অগ্রাধিকার দেয়া আমাদের জন্য মোটেই সমিচীন নয়। সুতরাং একমাত্র রসূলকেই ফায়ছালাকারী হিসাবে মানবো এবং একমাত্র তার সুন্নাতের সামনেই নিজেদেরকে সোপর্দ করবো ও তার সামনে নত হবো। মোটকথা আমরা একমাত্র রাসূলের সুন্নাতকে ঠিক সেভাবেই অনুসরণ করবো যেভাবে আমরা একমাত্র রসূল প্রেরণকারীর ইবাদত করে থাকি, তার জন্য নত হই, বিনীত হই, তার দিকেই ফিরে যাই এবং তার উপরই ভরসা করি।

সুতরাং দু’টি তাওহীদ বাস্তবায়ন করা জরুরী। এ দু’টি তাওহীদ বাস্তবায়ন করা ব্যতীত কোনো বান্দা আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পাবে না। রসূল প্রেরণ কারীর তাওহীদ এবং প্রেরিত রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণের তাওহীদ। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং একমাত্র রাসূলের সুন্নাতের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। আমরা রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কারো সুন্নাতের ফায়ছালা গ্রহণ করবো না এবং তার হুকুম ব্যতীত অন্য কারো হুকুম নিয়ে সন্তুষ্ট হবো না। সেই সঙ্গে তার আদেশ বাস্তবায়ন করা এবং তার খবরকে সত্যায়ন করার ক্ষেত্রে আমরা কোনো শাইখের কথা, কোনো ইমামের মতামত, মাযহাবের অনুসারীর

সমর্থন, কোনো ফির্কার ইমাম এবং মর্যাদাবান ব্যক্তির সিদ্বামেন্ত্মর অপেক্ষা করবো না। কিছু কিছু মানুষ রয়েছে, যারা তাদের শাইখ ও ইমামের অনুমতি ছাড়া রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাকে বাস্তবায়ন করে না এবং তার খবরকেও সত্যায়ন করে না। আর কোনো হাদীছ বা আয়াতের ব্যাপারে ইমামের কথা পাওয়া না গেলে তারা বলে, আমরা যেহেতু ইমামের অনুসরণ করি, আর ইমামদের কাছে এ হাদীছটি যেহেতু অবশ্যই পৌঁছে থাকবে, তাই তারা যা বলেছেন, আমার কথাও তাই। তারা কুরআন ও সুন্নাহর দলীলকে ইমামদের উপর সোপর্দ করে দেয় এবং রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশকে বাস্তবায়ন ও তার হাদীছকে সত্যায়ন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর এমনটি করা অসম্ভব হলে কুরআন-হাদীছের বক্তব্যকে তারা পরিবর্তন করে ফেলে। তারা এ পরিবর্তনকে তাবীল বা ব্যাখ্যা এবং অন্য অর্থে প্রয়োগ করে বলে নাম দিয়ে থাকে। তারা বলে থাকে আমরা এ আয়াত বা হাদীছের ব্যাখ্যা করছি এবং এ অর্থে ব্যবহার করছি।

আসল কথা হলো কোনো বান্দা তার রবের সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করার চেয়ে শির্ক ব্যতীত অন্যান্য সকল গুনাসহ সাক্ষাৎ করা অনেক ভালো। বান্দার অবস্থা এমন হওয়া উচিত, যখন তার কাছে রাসূলের কোনো ছহীহ হাদীছ পৌঁছাবে, তখন নিজেকে এরূপ ভাববে যে, সে স্বয়ং রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকেই হাদীছটি শুনেছে। তার জন্য কি এটি বৈধ হবে যে, রাসূলের হাদীছ তার কাছে আসবে আর সে তা কবুল করে নেয়ার আগে কারো কথা, মত বা মাজহাবের বক্তব্য আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? বরং তার উপর আবশ্যক হলো, সে রাসূলের হাদীছ বাস্তবায়ন করবে। অন্য কারো কথার প্রতি দৃষ্টি দিবে না। অন্য কারো কথার সাথে রাসূলের কথা সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে সে রাসূলের কথাকে বাতিল মনে করবেনা। বরং মানুষের যে মতামত হাদীছের বিরোধী হবে, সে ক্ষেত্রে মানুষের মতামতকেই বাতিল করবে। কিয়াসের মাধ্যমে কুরআন-হাদীছের দলীলের বিরোধিতা করবে না। যেমন কোনো কোনো মাজহাবের লোকেরা মুসার্রাতের হাদীছকে কিয়াসের বিরোধী হওয়ার কারণে বর্জন করে থাকে। মুসার্রাতের হাদীছটি হলো, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিয়েছেন, কেউ যদি এমন উটনী, গাভী, কিংবা বকরী খরীদ করে, বেশী দামে বিক্রি করার জন্য যার স্তনে দুধ আটকানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি দুধ কম পায়, তাহলে তার অধিকার রয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে উক্ত পশুটি ফেরত দিতে পারবে। ফেরত দেয়ার সময় পশুটির সাথে একসা পরিমাণ খেজুর দিয়ে দিবে। এ হাদীছটি ছহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কিয়াসের অনুসারীরা বলেছে, এ হাদীছটি মেনে নেয়া কঠিন। কেননা এটি কিয়াসের বিরোধী। তাই তারা এ হাদীছকে প্রত্যাখ্যান বা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। ফিক্বের কিতাবসমূহে তাহারাত অধ্যায় থেকে শুরু করে লেন-দেনের অধ্যায় পর্যন্ত এ ধরণের উদাহরণ আরো অনেক রয়েছে।

হাদীছের সাথে মানুষের কিয়াসসমূহ যখন সাংঘর্ষিক হবে তখন কিয়াস বাদ দিয়ে হাদীছ কবুল করে নেয়া আবশ্যক। আমাদের উচিত শরীয়তের দলীলকে স্বীয় স্থান থেকে মস্তিস্ক প্রসূত এমন কল্পনার কারণে সরিয়ে না দেয়া, যাকে তার উদ্ভাবকগণ বোধশক্তি দ্বারা জ্ঞাত দলীল হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। প্রকৃতপক্ষে তা জ্ঞাত বিষয় তো নয়ই; বরং তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একটি বিষয় এবং সত্য থেকে বহু দূরে। মোটকথা, কোনো ইমামের কথা না আসা পর্যন্ত রাসূলের কথাকে কবুল করে নেয়া থেকে বিরত থাকা যাবে না। সে যে-ই হোক না কেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের কাছে আনাস বিন ইয়ায বর্ণনা করেছেন, তিনি বর্ণনা করেছেন আবু হাযেম থেকে, আর তিনি বর্ণনা করেছেন আমর বিন শুআইব থেকে, আমর বিন শুআইব বর্ণনা করেছেন, তার পিতা থেকে, তার পিতা বর্ণনা করেছেন, তার দাদা থেকে। তার দাদা বলেন, একদা আমি এবং আমার ভাই এমন একটি উত্তম মজলিসে বসলাম, যা আমার দৃষ্টিতে লাল উট পাওয়ার চেয়ে উত্তম। আমি এবং

আমার ভাই সেখানে গমণ করলাম। তখন দেখলাম একদল বিজ্ঞ ছাহাবী রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো একটি ঘরের দরজায় বসে রয়েছেন। আমরা তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া অপছন্দ করলাম। তাই একটু দূরেই বসে পড়লাম। তখন তারা কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করার এক পর্যায়ে তাদের আওয়াজ উঁচু হলো। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন রাগান্বিত অবস্থায় তাদের নিকট আসলেন। তার চেহারা তখন ক্রোধে লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাদের প্রতি মাটি নিক্ষেপ করছিলেন এবং বলছিলেন, হে লোক সকল থামো! এ কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। তারা তাদের নাবীর সাথে মতভেদ করার কারণে এবং কিতাবের এক অংশকে অন্য অংশের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করার কারণে ধ্বংস হয়েছে। কুরআন এ জন্য নাযিল হয়নি যে, তার এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যায়ন করবে। বরং এ জন্য নাযিল হয়েছে যে, তার এক অংশ অন্য অংশকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিবে। কুরআনের যে অংশ তোমরা বুঝ, সে অনুযায়ী আমল করো এবং তার যে অংশ তোমাদের অজানা থাকে, তা আলেমদের নিকট পেশ করো।[16]

আল্লাহ তা‘আলা তার নামে বিনা ইলমে কথা বলা হারাম করেছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ

‘‘তুমি বলে দাও, আমার প্রতিপালক কেবল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন গুনাহ্, অন্যায় বাড়াবাড়ি, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, যার কোনো দলীল-প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা বলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, যা তোমরা জানো না’’। (সূরা আল ‘আরাফ: ৩৩) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

‘‘এমন কোনো জিনিসের পেছনে লেগে যেয়ো না যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চিয়ই চোখ, কান ও দিল সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে’’। (সূরা বানী ইসরাঈল: ৩৬)

সুতরাং বান্দার উপর আবশ্যক হলো, আল্লাহ তা‘আলা তার নাবী-রসূলদেরকে যাসহ প্রেরণ করেছেন, এবং তিনি যেসব কিতাব নাযিল করেছেন সে কেবল ঐ বিষয়কেই সত্য বলে স্বীকৃতি দিবে ও বিশ্বাস করবে। কেবল তার অনুসরণ করাই তার জন্য আবশ্যক। সে সত্যায়ন করবে যে, তা সত্য ও সঠিক। তা ছাড়া মানুষের যত কথা আছে, তাকে তার সামনে পেশ করবে। মানুষের যে কথা আল্লাহর পক্ষ হতে আগত অহীর সাথে মিলবে, তাও সত্য। আর যা তার সাথে মিলবে না, তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যেসব কথা সম্পর্কে জানা যাবে না যে, তা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীছের সাথে মিলেছে কি না, সে ক্ষেত্রে চুপ থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ কথা খুব সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে বক্তার কথা বুঝা না গেলে কিংবা কথাটি বুঝা গেলেও রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কথাটিকে সত্যায়ন করেছেন? না কি তিনি তাকে বাতিল করেছেন? তা অজ্ঞাত থাকার কারণেই তা কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যের বিরোধী কি না, তা বুঝা সম্ভব হয়ে উঠে না। আকীদার ক্ষেত্রে এরূপ সংক্ষিপ্ত কিংবা অস্পষ্ট কথাকে সমর্থন কিংবা বর্জন না করে নিরব থাকা বাঞ্ছনীয়। বিনা ইলমে কথা বলা অন্যায়। যে কথার পক্ষে কুরআন ও হাদীছের দলীল আছে, সেটিই প্রকৃত ইলম। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্যবাণী নিয়ে এসেছেন, তাই আমাদের জন্য উপকারী।

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্যদের কথার মধ্যেও ইলম রয়েছে। তবে তা দ্বীনি বিষয়ের ইলম

নয়; বরং তা পার্থিব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদির ইলম। যেমন ডাক্তারী বিদ্যা, হিসাব বিজ্ঞান এবং কৃষি বিজ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং দ্বীনি বিষয়াদির ব্যাপারে কথা হলো তা কেবল রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই গ্রহণ করতে হবে।

ফুটনোট

[15]. ছহীহ বুখারী হা/৫৫৪ ও ছহীহ মুসলিম হা/৬৩৩।

[16]. ছহীহ: শারহুস সুন্নাহ ১২১।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8929

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন